

বর্ধমান জেলার তফসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পঞ্চায়েতের অবদান (১৯৭৪- ২০০৮) : একটি ইতিহাস সমন্বিত বিশ্লেষণ

মিঠু মাঝি, গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি

ড. বিশ্বরূপ গোস্বামী, তত্ত্বাবধায়ক, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি

ভূমিকা

ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় স্থানীয় স্বশাসন বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যেমন তফসিলী জাতি (SC) ও উপজাতি (ST), তাদের অর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নারী ক্ষমতায়ন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে পঞ্চায়েতের ভূমিকা অপরিহার্য। বর্ধমান জেলা, যা ঐতিহাসিকভাবে কৃষি ও শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে SC/ST সম্প্রদায়ের মানুষ বহু বছর ধরে সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও শিক্ষাগত পশ্চাদ্গতির মধ্যে ছিল। ১৯৭৭ সালের পর পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই প্রবন্ধে ১৯৭৪ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বর্ধমান জেলার পঞ্চায়েত-কেন্দ্রিক কার্যক্রমের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হবে এবং দেখানো হবে যে, SC/ST সম্প্রদায়ের অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পঞ্চায়েত একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে।^১ আলোচ্য প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে বর্ধমান জেলার একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি উঠে আসবে বলে আশা করা যায়। একইসঙ্গে তফসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবনচর্যা নানা তথ্য ও বিশ্লেষণ এর মধ্যে দিয়ে আরো বেশি স্বচ্ছ হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত বলতে হয়, ভারতের সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনী (১৯৯২) পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করে। এই সংবিধানিক স্বীকৃতি স্থানীয় স্তরে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ বাড়ায় এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সরাসরি উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। “স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে মানুষের কাছে সরকারকে পৌঁছে দেওয়া” ছিল এর মূল লক্ষ্য।^২ সংবিধানিক স্বীকৃতি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৈধতা প্রদান করে এবং SC/ST সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধানের পথ সুগম করে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিভিন্ন দিক ধরে বর্ধমান জেলার পুরো বিষয়টি

অনুসন্ধান করা যায়। একইসঙ্গে এই দীর্ঘ সময়ের নিরিখে অনুধাবন করা যায় কতখানি এগিয়েছে এই বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবনের প্রাথমিক ও অন্যান্য দিক গুলি। সেখান থেকেই তো অনুধাবন করা যাবে এই নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত জনগোষ্ঠীর অর্থ-সামাজিক অবস্থা ও তাদের বর্তমান অবস্থান।

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব সমস্যা চিহ্নিত করতে পারে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারে। এটি বিশেষভাবে SC/ST সম্প্রদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নীতি থেকে বঞ্চিত ছিল।^৭

বর্তমান জেলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয়, ১৯৭১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বর্ধমান জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ SC/ST জনগোষ্ঠীভুক্ত।^৮ তাদের প্রধান পেশা ছিল কৃষিশ্রমিক, কয়লাখনি-শ্রমিক, ক্ষুদ্রশিল্প ও দৈনিক মজুরি ভিত্তিক কাজ। তবে জমির মালিকানা, শিক্ষার সুযোগ এবং স্বাস্থ্যসেবা—সব ক্ষেত্রেই তারা বঞ্চিত ছিল। “বর্ধমান জেলার তফসিলী জাতির মধ্যে ভূমিহীনতা সর্বাধিক, আর উপজাতি জনগোষ্ঠী প্রায় সম্পূর্ণরূপে অরণ্য নির্ভর ছিল।”^৯ বর্ধমান জেলার সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আরও ব্যাপকভাবে বিভিন্ন তথ্য ও তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। একইসঙ্গে বেশকিছু ক্ষেত্রসমীক্ষারও প্রয়োজন হয়।

একথা অনস্বীকার্য যে, এই নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে পঞ্চায়েতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। ভূমি সংস্কার, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করে SC/ST সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে পঞ্চায়েত একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করেছে। পঞ্চায়েত নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এটি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয়, সামাজিক স্বীকৃতি ও ক্ষমতায়নেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে সমগ্র সমাজজীবনে। যা এই প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয়।

ভূমি সংস্কার ও পুনর্বন্টন বিষয়টি এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে কোন জনসমাজের ভূমি সংস্কার ও পুনর্বন্টন বিষয়টি খুবই মনোযোগ সহকারে দেখবার প্রয়োজন রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৭৭ সালের পর বামফ্রন্ট সরকারের অপারেশন বর্গা এবং জমির ceiling আইন কার্যকর করা হয়। এর ফলে বিপুলসংখ্যক কৃষিশ্রমিক ও ভূমিহীন চাষি, বিশেষত SC/ST সম্প্রদায়ের মানুষ, বর্গাদার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৮৫ সালের মধ্যে

বর্ধমান জেলায় প্রায় ১.২ লক্ষ পরিবার বর্গাদার স্বীকৃতি পায়, যার মধ্যে প্রায় অর্ধেকই SC/ST সম্প্রদায়ভুক্ত।^৬

বিশিষ্ট গবেষকের অভিমত হলো-“ভূমি সংস্কার বর্ধমান জেলার SC/ST সম্প্রদায়ের আর্থিক নিরাপত্তার প্রথম পদক্ষেপ”।^৭ জমির উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের জীবনে স্থিতিশীলতা আসে এবং তারা ধীরে ধীরে শিক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এটি দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ভিত্তি স্থাপন করে।

শিক্ষা ও সাক্ষরতার প্রসার বিষয়টি এক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অল্প, বস্ত্র ও বাসস্থানের চাহিদা মিটিয়ে যেকোনো জনগোষ্ঠী তবেই উন্নততর চাহিদার কথা ভাবতে পারে। এই পরিস্থিতি ভারতবর্ষে খুবই মনোযোগ সহকারে দেখবার চেষ্টা করা হলেও বাস্তবিক তা কতখানি সম্পূর্ণ হয়েছে যাচাই করবার বিস্তর অবকাশ রয়েছে।

পঞ্চায়েতের অন্যতম বড় অবদান ছিল প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার। সার্বিক শিক্ষা অভিযান (SSA), মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প (mid day meal) এবং পঞ্চায়েত পরিচালিত বিদ্যালয় নির্মাণ ও পুনর্গঠন SC/ST শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে সাহায্য করেছে। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, মিড ডে মিল চালু হওয়ার ফলে এবং বেশ কিছু স্কলারশিপ চালু করার ফলে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এই স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রবেশ আরও ব্যাপকভাবে ভিত্তি পেয়েছে। পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা পৌঁছতে পেরে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করবার নানা দিক খুঁজে পেয়েছে। সাক্ষরতা অভিযান একটা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কতখানি আশীর্বাদ হতে পারে এই তথ্য থেকে তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। এই তথ্য থেকে বলা যায় একটা রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে কোন স্তরের মানুষের অগ্রগতি প্রয়োজন। জাতীয়তা বোধ ও আন্তর্জাতিকভাবে দেশের মানুষকে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রয়োজন। পঞ্চায়েতের এই ভূমিকার শুধু প্রসারী ফল হিসেবে তা গণ্য করা যায়। বর্ধমান জেলা সেক্ষেত্রে একেবারেই ব্যতিক্রম নয় বলেই দাবি করা যায়।

২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী “বর্ধমান জেলার SC সম্প্রদায়ের সাক্ষরতার হার ছিল প্রায় ৬০%, যা ১৯৭১ সালের ২৫% থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই হার তুলনামূলকভাবে কম হলেও ১৯৭১ সালের ১৮% থেকে বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৪৮%।”^৮ এই যুক্তি নির্ধারণের জন্য এবং প্রতিষ্ঠার জন্য আরো একজন সমীক্ষকের মন্তব্য তুলে দেওয়া হলো,- “পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিদ্যালয় নির্মাণ, শিক্ষক নিয়োগ ও ছাত্রবৃত্তি কার্যক্রম SC/ST শিক্ষার্থীদের

শিক্ষাগত পশ্চাদ্গততা ভাঙতে সহায়ক হয়েছে”।^{১০} এছাড়া পঞ্চায়েতের স্কুল নির্মাণ ও শিক্ষকদের নিয়োগে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক হয়। ফলে বর্ধমান জেলার অভিমুখ ক্রমশু স্পষ্ট হয়ে যায়। বর্ধমান জেলার তফসিলী জাতি ও উপজাতির অর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো গঠনের ইতিহাস ও সূত্র সন্ধান ক্রমশ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যায় পঞ্চায়েতের গভীর পদচারণা ও প্রভাবের দিকটি। পঞ্চায়েত একপ্রকার নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তবে পরিকল্পনার সঙ্গে বাস্তবায়নের যে গভীর যোগাযোগ রয়েছে, তার নেপথ্যে প্রগতিশীল মানুষের যোগাযোগ থাকাটা জরুরী। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অনেক বড় বড় পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকতার পর্যায়ে থেকে গেছে তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়নি।

এই আলোচনার ক্রম বিস্তারে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মসূচির বিষয়টিও মনোযোগ দেওয়া জরুরী বলে মনে করি। পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আশা প্রকল্প, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন SC/ST অধ্যুষিত গ্রামে শিশু মৃত্যু হ্রাস এবং মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বর্ধমান সেক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়। তফসিলী জাতি ও উপজাতির অর্থ-সামাজিক পটভূমির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মসূচির ভূমিকা ব্যাপক বলে স্বীকার করতে হয়।

একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায়, “১৯৯০-এর দশকে বর্ধমান জেলার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বিস্তার শিশুদের পুষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ছিল”।^{১১} পঞ্চায়েতের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা সহ বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা, পরিকল্পনা ও প্রচার তথা জনসংযোগ উক্ত জনগোষ্ঠী সহ সমগ্র গ্রামীণ সমাজে পৌঁছানোর ফলে স্থানীয় জনগণের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা দেখা যায়।

করোনাকালীন (কোভিড 19) পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েত যে ভূমিকা পালন করেছে তা ভুলবার নয়। পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের দীর্ঘ সময় জুড়ে বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মহামারী পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েত আরো সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বর্ধমান জেলার ছবি এক্ষেত্রে খুবই ইতিবাচক হলেই দাবি করা যায়। গবেষণা সীমা যদিও ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ। তাহলে ও প্রাসঙ্গিকতা ধরে সাম্প্রতিককালের বিষয়টি একটু বলবার চেষ্টা করা হলো মাত্র। যা জনমানসে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে।

কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসনে পঞ্চায়েত যে ভূমিকা পালন করেছে তার নানা দিক রয়েছে। বর্ধমানের তফসিলী জাতি ও উপজাতি ভুক্ত সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পঞ্চায়েতে ভূমিকা

স্মরণীয়। যা সারা পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে। ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে IRDP (Integrated Rural Development Programme) এবং ২০০৫ সালে NREGA চালু করে SC/ST সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই সুযোগের সদ্যবহার বর্ধমান জেলা খুব ভালোভাবেই করেছিল। যা ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

সেই অনুযায়ী কিছু তথ্য তুলে ধরবার চেষ্টা করা হলো। “বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম, রায়না, মেমারি প্রভৃতি ব্লকে ২০০৭-০৮ সালে প্রায় ৪.২ লক্ষ পরিবার NREGA-র মাধ্যমে কর্মসংস্থান লাভ করে, যার মধ্যে প্রায় ৪৫% পরিবার SC/ST সম্প্রদায়ভুক্ত”।^{১১} এটি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং দৈনন্দিন জীবনে স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ বিষয়টি যেকোনো উন্নয়নশীল দেশের কাছে অনুপ্রেরণা হতে পারে।।

বর্তমান জেলার উক্ত সম্প্রদায়ের অর্থ সামাজিক উন্নয়নে যে তথ্য তত্ত্ব বাস্তবতা ও যুক্তি তুলে ধরবার চেষ্টা করা হচ্ছে তার নেপথ্যে একটি বিষয় উপেক্ষা করা যায় না। সেটা হলো, নারীর ভূমিকা। নারীর সক্রিয়তা, শিক্ষিত হয়ে ওঠা, অর্থনৈতিকভাবে সম্পন্ন ওটার মানসিকতা, ক্ষুদ্র ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মানসিকতা, একইসঙ্গে কলকারখানায় কাজ করে জীবন সচল রাখবার ভূমিকা নারী কম করেনি। সেক্ষেত্রে নারী সমাজের ক্ষমতায়নের সচেতন ভাবে ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন রয়েছে। SC/ST নারীরা স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) গঠন ও মাইক্রোক্রেডিট কর্মসূচির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা নারী জীবনের এক সূর্যোদয় বলা যেতে পারে। পঞ্চায়েত আইনে SC/ST জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষিত হওয়ার ফলে তারা নেতৃত্বের ভূমিকায় আসতে পারে। গ্রামে গ্রামে নারীরা হয়ে উঠেছে পঞ্চায়েত সদস্য, অঞ্চল প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, জেলা পরিষদের সদস্য ও বিভিন্ন বিধানসভার বিধায়ক। নারীর এই অগ্রগতির ইতিহাস পঞ্চায়েত যেন খুব যত্ন করেই লিখতে চেয়েছে। সেক্ষেত্রে তফসিলী জাতি ও উপজাতি পিছিয়ে থাকেনি। তাদের অংশগ্রহণ ঐতিহাসিকভাবে যুগান্তকারী ও শুধু প্রসারী হয়ে উঠেছে। তথ্য হিসাবে তুলে ধরা যেতে পারে যে, বর্ধমান জেলার রায়না ব্লকে SC/ST নারীরা পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে স্থানীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পানীয় জলের প্রকল্প পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। এতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ঠিক কতখানি কার্যকরী হয়েছে তার কল্পনা করতে হয় না। একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে যেন দেখিয়ে দেওয়া যায়।

পঞ্চায়েতের ভুরি ভুরি প্রশংসা ও সুদূরপ্রসারীর ভূমিকা পালন ঐতিহাসিকভাবে যেমন সত্য হয়ে উঠেছে একইসঙ্গে এই সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা রয়েছে, যা স্বীকার করা যায় না। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ইতিবাচক ভূমিকার সঙ্গে বেশি কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেসব কথা এড়িয়ে গেলে আলোচ্য বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

তফসিলী জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক সময় উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যাহত হয়েছে। প্রভাবশালীরা প্রভাব খাটিয়ে সবটা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। সেক্ষেত্রে উপজাতি সম্প্রদায় আঙুল চুষেছে। বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত অরণ্যাঞ্চলে উন্নয়ন কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। বর্ধমান জেলা একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে বলে দাবি করা যায়। প্রকৃত সুযোগ-সুবিধা থেকে উপজাতিভুক্তরা বঞ্চিত হয়েছে। উচ্চবর্ণপ্রভাব শালীরা ব্যক্তিস্ব বুদ্ধিমত্তার খেলা চালিয়ে অনেক পঞ্চায়েত নিজেদের হাতের চোটোর মধ্যে রাখে। সে ক্ষেত্রে সবকিছু সুযোগ সুবিধা, ডাকসাইটে প্রভাবশালীরা ভোগ করে। সেই পরিস্থিতি থেকে এখনো ষোলআনা পরিত্রাণ হয়নি বলেই দাবি করা যায়।

একইসঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নানা অগ্রগতি হলেও প্রকৃত অর্থে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মান নিয়ে বেশ কিছু সমস্যা থেকেই গেছে। তার সমস্যা সমাধানে আরো ব্যাপক পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে বলে অনুভূত হয়। একথা অনস্বীকার্য যে, পঞ্চায়েত বিভিন্ন পরিকল্পনা ও অভিযুক্ত ধরে SC/ST সম্প্রদায়ের কাছে অজস্র সুযোগ ও পথ তৈরি করেছে, কিন্তু সামাজিক বৈষম্য পুরোপুরি দূর হয়নি। সামাজিক বৈষম্যের জন্য অনেক পরিকল্পনা আদৌ বাস্তবায়িত হয়নি। কিংবা যেটুকু হয়েছে তা গাল ভরা প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পরিশেষে বলতে হয়, ১৯৭৪ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বর্ধমান জেলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা SC/ST সম্প্রদায়ের অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেই ভূমিকা ঐতিহাসিক ভাবে যতখানি সত্য ঠিক ততখানি সামাজিকভাবে ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। ভূমি সংস্কার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, নারীর সামাজিক অবস্থার পটপরিবর্তন, শিশু ও কিশোরদের জীবনের নানা দিক পরিবর্তন সহ নারী জীবনের ব্যাপক ক্ষমতায়ন-সব ক্ষেত্রেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। প্রদীপের তলায় যেমন অন্ধকার জমে থাকে, তেমন কিছু অন্ধকার ও জমে রয়েছে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার একেবারে মূলে। প্রগতিশীল মানসিকতা নিয়ে সেগুলো অবশ্যই সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। সেই সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তফসিলী জাতি ও উপজাতি অনেক আশর আলো দেখেছে। অর্থ-সামাজিকভাবে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। আগামী দিনে

নিশ্চিত ভাবে আরও এগিয়ে যাবে। তবে সীমাবদ্ধতা এড়ানোর জন্য বেশ কিছু প্রতিরোধ প্রয়োজন রয়েছে। সব মিলিয়ে বলতে হয়, পঞ্চায়েত-কেন্দ্রিক উন্নয়ন মডেল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনে নতুন আশার আলো নিয়ে এসেছে। নতুন ভবিষ্যৎ এনে দিয়েছে। যা নতুন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। বর্ধমান জেলা সেক্ষেত্রে মডেল হিসেবেও পরিগণিত হতে পারে।

তথ্যসূত্র

১. ভট্টাচার্য, দ্বৈপায়ন। পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা. কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃঃ-৭২
২. ভারত সরকারের আদমশুমারি। জেলা আদমশুমারি: বর্ধমান, ১৯৭১। রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া।
৩. চক্রবর্তী, শম্ভু। কৃষি বর্ধমান: অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ. কলকাতা: তুলিকা, ২০০৪, পৃঃ-১১৯
৪. বসু, প্রদীপ। বামপন্থী রাজনীতি বর্ধমানে: শ্রেণি, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি. কলকাতা: মিনারভা, ১৯৯০, পৃঃ-২০৩
৫. মুখার্জী, আদিত্য। বঙ্গের কৃষক আন্দোলন. দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৫, পৃঃ-১৪৭
৬. ভারত সরকারের আদমশুমারি। জেলা প্রোফাইল: বর্ধমান, ২০০১। রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া।
৭. সরকার, সুমিতা। শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তন বর্ধমান. কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ২০০২, পৃঃ-৮৮
৮. ব্যানার্জী, মধুমিতা। স্বাস্থ্য ও গ্রামীণ উন্নয়ন বর্ধমান. কলকাতা: কে.পি. বাগচি, ২০০৭, পৃঃ-১৩২
৯. পশ্চিমবঙ্গ সরকার। MGNREGA বার্ষিক প্রতিবেদন: বর্ধমান, ২০০৮, পৃঃ-৫৪
১০. চট্টোপাধ্যায়, মালিনী। বর্ধমানের পঞ্চায়েতে নারী. কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৬, পৃঃ-৯৭
১১. রায়, তীর্থঙ্কর। বর্ধমানের গ্রামীণ উন্নয়ন রাজনীতি. দিল্লি: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসওয়ান, ২০০৯, পৃঃ-২১৪